উৎসর্গ

আমার এই ক্ষুদ্র সৃষ্টির প্রতিটি শব্দ, অনুভূতি ও না-বলা গল্প উৎসর্গ করলাম সেই সকল পাঠকের প্রতি, যাঁরা শব্দের আড়ালে খুঁজে নেন জীবনের অর্থ, অনুভূতির গভীরতা আর নিজের প্রতিচ্ছবি।

আপনাদের ভালোবাসা ও অনুভবেই আমার লেখার সার্থকতা।

— মোঃ সাকিবুল ইসলাম

ভূমিকা

জীবন কখনো শান্ত নদীর মতো, কখনো উত্তাল সমুদ্রের মতো। কখনো সেখানে ভালোবাসার মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে পড়ে, আবার কখনো বিচ্ছেদ, অভিমান আর অপ্রাপ্তির নীরব দীর্ঘশ্বাস জমে থাকে। কিছু অনুভূতি সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যায়, আর কিছু অনুভূতি হৃদয়ের গভীরে চিরকাল রয়ে যায়।

‘নীল দরিয়া’ কেবল একটি নাম নয়, এটি অনুভূতির গভীরতা, জীবনের নানা বাঁক এবং অজস্র না-বলা কথার এক কল্পনাময় উপাখ্যান। এই উপন্যাসের প্রতিটি শব্দে মিশে আছে আবেগ, সম্পর্ক, স্বপ্ন, বাস্তবতা ও জীবনের কিছু অমোঘ সত্য।

কিছু গল্পের শুরু হয় অজান্তে, কিছু সম্পর্কের জন্ম হয় নিঃশব্দে, আর কিছু বিচ্ছেদ রেখে যায় আজীবনের শূন্যতা। সেই চেনা-অচেনা অনুভূতির পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে এই উপন্যাসের গল্প।

হয়তো সব গল্পের শেষ সুন্দর হয় না, সব স্বপ্ন পূর্ণতা পায় না; তবুও জীবনের প্রতিটি অসমাপ্ত অধ্যায়ের নিজস্ব এক সৌন্দর্য থাকে।

নীল দরিয়ার গভীরতায় মিশে থাকুক জীবনের কিছু রং, কিছু দীর্ঘশ্বাস, কিছু ভালোবাসা আর এক সমুদ্র না-বলা গল্প।

– নীল দরিয়া

সেদিন সন্ধ্যার আকাশটা অন্য দিনের মতো ছিল না। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে, আর সমুদ্রের নীল জলরাশি শেষ আলোটুকু নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিচ্ছিল। দূরে মাছ ধরার নৌকাগুলো তীরের দিকে ফিরছিল, বাতাসে ভেসে আসছিল লবণাক্ত জলের গন্ধ। সৈকতে মানুষের ভিড় থাকলেও শাকুর মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটা যেন হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেছে।

সে একা হাঁটছিল সমুদ্রের পাড় ধরে।

জীবনে এমন কিছু সময় আসে, যখন মানুষের কাছে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও মনে হয়, কোথাও যেন কিছু একটা নেই। শাকুর জীবনেও সেই শূন্যতাটা অনেক দিন ধরে জমে ছিল। বন্ধুবান্ধব ছিল, পরিচিত মানুষ ছিল, হাসি-আড্ডাও ছিল; তবু দিনের শেষে নিজের কাছে ফিরে এলে তার মনে হতো, সে যেন এমন একটা পথ ধরে হাঁটছে, যার শেষ কোথায়, তা সে নিজেও জানে না।

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তার জীবনে এই অনুভূতিটা আরও গভীর হয়েছে। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল বন্ধুর মতো। ছোটবেলায় কোনো কিছু বুঝতে না পারলে বাবার কাছে ছুটে যেত। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পেলে বাবা বলতেন, “ভয় পাস না, শাকু। জীবনে ভুল করবি, আবার সেই ভুল থেকে শিখেও নিবি। কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে কখনো ছোট হবি না।”

কথাগুলো এখনো তার কানে বাজে।

কিন্তু মানুষ চলে গেলে তার কণ্ঠস্বর থেকে যায় স্মৃতিতে, আর সেই স্মৃতিগুলোই কখনো কখনো জীবনের সবচেয়ে বড় কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়।

শাকু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল মেয়েটিকে।

মেয়েটি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। পরনে নীল রঙের পোশাক, খোলা চুল বাতাসে উড়ছে। তার হাতে একটি পুরোনো ডায়েরি, আর আঙুলের মধ্যে শক্ত করে ধরা ছোট্ট রুপালি লকেট। সে একদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন ঢেউয়ের ওপারে এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে, যার জন্য সে বহু বছর ধরে অপেক্ষা করছে।

শাকু প্রথমে নিজের পথেই হাঁটছিল। কিন্তু মেয়েটির চোখের দিকে একবার তাকানোর পর তার পা থেমে গেল। চোখ দুটো অদ্ভুত সুন্দর, অথচ সেই সৌন্দর্যের গভীরে এমন এক বিষণ্নতা লুকিয়ে ছিল, যা সহজে চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়।

হঠাৎ মেয়েটি বলল, “সমুদ্রকে কখনো বিশ্বাস করবেন না।”

শাকু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

“কেন? সমুদ্র কি আপনার সঙ্গে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?”

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটলেও চোখের বিষণ্নতা একটুও কমল না।

“সমুদ্র কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। মানুষ করে। তারপর নিজেদের অপরাধ লুকানোর জন্য সমুদ্রকে দোষ দেয়।”

কথাটা শুনে শাকু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। অচেনা একজন মানুষের মুখে এমন কথা শুনে তার কৌতূহল বেড়ে গেল।

“আপনি কি কাউকে হারিয়েছেন?”

মেয়েটি উত্তর দিল না। বরং ডায়েরিটা বুকের কাছে টেনে নিল। মনে হলো, শাকুর প্রশ্নটা তার হৃদয়ের এমন কোনো জায়গায় গিয়ে লেগেছে, যেখানে সে কাউকে প্রবেশ করতে দিতে চায় না।

কিছুক্ষণ পর সে নিজেই প্রশ্ন করল, "আপনার নাম কি শাকু?"

শাকুর ভ্রু কুঁচকে গেল।

"জি। কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে?"

মেয়েটি এবার তার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল।

"কারণ, আমি আপনাকে খুঁজছিলাম।"

শাকুর বুকের ভেতর অজানা একটা আশঙ্কা জন্ম নিল। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল, তাদের আশপাশে পরিচিত কেউ নেই।

"আপনি কে?"

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আমার নাম সুভাসিনী।"

নামটা শোনার পর শাকু অদ্ভুত একটা অনুভূতি অনুভব করল। মনে হলো, এই নামটি সে আগে কোথাও শুনেছে। হয়তো কোনো পুরোনো স্মৃতিতে, হয়তো বাবার মুখে শোনা কোনো গল্পে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না।

সুভাসিনী ডায়েরির ভেতর থেকে একটি পুরোনো ছবি বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ছবিতে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। তাঁর পাশে একটি ছোট ছেলে। ছবিটি অনেক পুরোনো হলেও মানুষ দুজনের মুখ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

ছবির মানুষটিকে চিনতে শাকুর এক মুহূর্তও লাগল না।

তিনি তার বাবা।

আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছেলেটি শাকু নিজেই।

তার হাত কেঁপে উঠল।

"এই ছবিটা আপনার কাছে এল কীভাবে?"

সুভাসিনী নিচু গলায় বলল, "আপনার বাবা আমার মাকে দিয়েছিলেন।"

"আপনার মা আমার বাবাকে চিনতেন?"

"শুধু চিনতেন না। তাঁদের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক ছিল, যার কথা আপনার পরিবার কখনো জানতে পারেনি।"

শাকু অবিশ্বাসের চোখে তাকাল।

"কীসের সম্পর্ক?"

সুভাসিনী উত্তর দেওয়ার আগে ছবির পেছনটা তার দিকে ঘুরিয়ে দিল। সেখানে নীল কালিতে কয়েকটি শব্দ লেখা ছিল—

যেদিন সত্য ফিরে আসবে, সেদিন নীল দরিয়ার কাছে এসো।

লেখাটা দেখেই শাকুর মনে হলো, তার পায়ের নিচের বালু সরে যাচ্ছে। কারণ, এই হাতের লেখা তার পরিচিত। ছোটবেলায় বাবার লেখা চিঠি, জন্মদিনের কার্ড আর বইয়ের পাতায় লেখা উপদেশ—সবখানেই সে এই হাতের লেখা দেখেছে।

এটি তার বাবার লেখা।

"নীল দরিয়া কী?" শাকু জিজ্ঞেস করল।

সুভাসিনী সমুদ্রের দিকে তাকাল।

"এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে আমার বাবা হারিয়ে গিয়েছিলেন। আর সেই ঘটনার সঙ্গে আপনার বাবার নাম জড়িয়ে আছে।"

"আপনার বাবা হারিয়ে গিয়েছিলেন মানে?"

"পনেরো বছর আগে আমার বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। তাঁর মরদেহও পাওয়া যায়নি। সবাই ধরে নিয়েছিল, তিনি সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। কিন্তু আমার মা কখনো বিশ্বাস করেননি যে তিনি মারা গেছেন।"

শাকু চুপ করে শুনছিল।

সুভাসিনী আবার বলল, "পাঁচ বছর আগে আমার মাও নিখোঁজ হয়ে যান। যাওয়ার আগে তিনি একটি চিঠি রেখে গিয়েছিলেন। সেখানে আপনার বাবার নাম লেখা ছিল। তিনি লিখেছিলেন, কোনো দিন যদি সত্য জানার সুযোগ আসে, তাহলে যেন আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি।"

"কিন্তু আমার বাবার মৃত্যু তো পাঁচ বছর আগেই হয়েছে।"

"আমি জানি।"

"তাহলে এখন কেন?"

সুভাসিনী ডায়েরির একটি পাতা খুলে দেখাল। সেখানে একটি তারিখ লেখা ছিল। তারিখটি ছিল শাকুর বাবার মৃত্যুর আগের দিন।

তার নিচে লেখা—

মাহমুদ রহমানকে বিশ্বাস করা যাবে না। নীল দরিয়ার সত্য প্রকাশ পাওয়ার আগে সবকিছু শেষ হয়ে যেতে পারে।

শাকু নামটা পড়ে থমকে গেল।

"মাহমুদ রহমান কে?"

"আমি জানি না। তবে আমার মা তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন। আর আপনার বাবাও তাঁকে চিনতেন।"

শাকু এবার কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চাইছেন, নাকি শুধু রহস্য তৈরি করছেন? আমার বাবার নাম, তাঁর পুরোনো ছবি, অচেনা একজন মানুষের নাম—এসবের মানে কী?"

সুভাসিনী তার চোখের দিকে তাকাল। তার চোখে এবার জল চিকচিক করছে।

"আপনার বাবা মারা যাওয়ার আগে এমন একটা সত্য জেনে গিয়েছিলেন, যার কারণে তাঁকে চিরদিনের জন্য চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

শাকুর মুখ শক্ত হয়ে গেল।

"আপনি বলতে চাইছেন, আমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে?"

সুভাসিনী মাথা নিচু করল।

"আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু আমার মা বিশ্বাস করতেন, আপনার বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না।"

শাকু কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। বাবার মৃত্যুর স্মৃতি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। হাসপাতালের বিছানা, সাদা চাদর, আত্মীয়স্বজনের কান্না—সবকিছু যেন আবার নতুন করে ফিরে এল।

"আপনি এসবের প্রমাণ দিতে পারবেন?"

"পারব। কিন্তু তার জন্য আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"পুরোনো বাতিঘরে। আগামীকাল রাত আটটায়।"

শাকু কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, "আমি যাব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, সুভাসিনী—আমি সত্য জানতে চাই। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কাউকে অপরাধী ভাবতে পারব না।"

সুভাসিনী মৃদু হাসল।

"আপনার বাবা ঠিক এমন কথাই বলতেন।"

কথাটা শুনে শাকুর বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠল। সে আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুভাসিনী আর দাঁড়াল না। ডায়েরিটা বুকে চেপে ধরে ধীরে ধীরে চলে গেল।

শাকু অনেকক্ষণ তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেদিন সে জানত না, এই মেয়েটিই একদিন তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হয়ে উঠবে। আবার এই মেয়েটির কাছেই তাকে এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর চাইতে হবে, যেগুলোর উত্তর হয়তো তাদের ভালোবাসাকে ভেঙে দেবে।

পরদিন রাত আটটার কিছু আগে শাকু পুরোনো বাতিঘরের কাছে পৌঁছাল। চারপাশ নির্জন, বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। দূরে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভাঙা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে সুভাসিনী তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

শাকু কাছে যেতেই সুভাসিনী বলল, "আপনি এসেছেন।"

"আপনি ডেকেছিলেন।"

"আমি ভেবেছিলাম, হয়তো আসবেন না।"

"আপনি যদি সত্যিই আমার বাবার ব্যাপারে কিছু জানেন, তাহলে আমি কেন আসব না?"

সুভাসিনী কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ব্যাগ থেকে একটি পুরোনো খাম বের করল।

খামের ওপর লেখা ছিল—শাকুর জন্য।কিন্তু লেখাগুলো স্পষ্ট।

শাকু খাম খুলে চিঠিটা বের করল। কাগজটি হলদে হয়ে গেছে,

যে মানুষটি এই চিঠি পড়বে, সে হয়তো আমাকে ভুল বুঝবে। কিন্তু আমার অনুরোধ, কাউকে বিচার করার আগে তার নীরবতার কারণ খুঁজে দেখো। সব

অপরাধী মুখে মিথ্যা বলে না, আর সব নির্দোষ মানুষ নিজের পক্ষে কথা বলতে পারে না।

চিঠির শেষে লেখা ছিল—

মাহমুদকে খুঁজে বের করো। সে জানে, নীল দরিয়ার রাতে কী ঘটেছিল।

শাকু চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল।

"আপনি এই চিঠি কোথায় পেলেন?"

"আমার মায়ের পুরোনো বাক্সে। মা নিখোঁজ হওয়ার পর আমি বাক্সটা খুঁজে পাই।"

"তাহলে আপনার মায়ের কাছে আমার বাবার চিঠি কেন ছিল?"

সুভাসিনী উত্তর দেওয়ার আগেই দূরে একটি গাড়ির শব্দ শোনা গেল। কালো রঙের একটি গাড়ি বাতিঘরের সামনে এসে থামল। গাড়ি থেকে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ নামলেন। পরনে ধূসর স্যুট, চোখে কালো চশমা। তাঁর হাঁটার ভঙ্গিতে এমন এক ধরনের আত্মবিশ্বাস ছিল, যেন এই নির্জন জায়গাটিও তাঁর নিজের সম্পত্তি।

লোকটিকে দেখেই সুভাসিনীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

লোকটি শান্ত গলায় বললেন, "তোমাকে অনেকবার বলেছি, অতীত খুঁড়ে কোনো লাভ নেই।"

সুভাসিনী রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমার মাকে কোথায় রেখেছেন?"

লোকটি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শাকুর দিকে তাকালেন।

“তুমি নিশ্চয়ই শাকু।”

শাকু সোজা হয়ে দাঁড়াল।

“আপনি মাহমুদ রহমান?”

লোকটি চশমা খুললেন। তাঁর চোখে কোনো বিস্ময় নেই, বরং এমন এক শীতল দৃষ্টি, যা দেখে শাকুর মনে হলো, এই মানুষটি অনেক দিন ধরেই তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

“হ্যাঁ। আমিই মাহমুদ রহমান।”

শাকু আর দেরি করল না।

“আমার বাবার মৃত্যুর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?”

মাহমুদ মৃদু হাসলেন।

“তোমার বাবা ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু ভালো মানুষদেরও ভুল হয়। আর সেই ভুলের মূল্য কখনো কখনো তাদের সন্তানদেরও দিতে হয়।”

“কী ভুল করেছিলেন আমার বাবা?”

মাহমুদ সুভাসিনীর দিকে তাকালেন।

“ভুলটা করেছিলেন, এই মেয়েটির মাকে বিশ্বাস করে।”

সুভাসিনী চিৎকার করে উঠল, “মিথ্যা বলছেন আপনি!”

মাহমুদ নির্বিকারভাবে বললেন, "তুমি এখনো পুরো সত্য জানো না, সুভাসিনী। আর শাকু, তোমারও অনেক কিছু জানা বাকি।"

শাকু এক পা এগিয়ে গেল।

"আপনি আমার বাবাকে চিনতেন?"

"খুব ভালো করে।"

"তাহলে তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যিটা বলুন।"

মাহমুদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তুমি যদি সত্যিই জানতে চাও, তাহলে আজ রাতেই আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে এমন কিছু দেখাব, যা দেখার পর তুমি নিজেই বুঝবে, এত দিন কাকে বাবা বলে জেনেছ।"

শাকুর চোখে রাগ জমল।

"আমার বাবাকে নিয়ে আর একটা কথাও বলবেন না।"

মাহমুদ ঠান্ডা গলায় বললেন, "আবেগ দিয়ে সত্য বদলানো যায় না, শাকু।"

তারপর তিনি গাড়ির দিকে ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে একবার পেছনে তাকিয়ে বললেন, "আর একটা কথা মনে রেখো—তোমার জন্মের সত্যটাও হয়তো এই নীল দরিয়ার কাছেই লুকিয়ে আছে।"

গাড়িটি চলে যাওয়ার পর বাতিঘরের সামনে আবার নীরবতা নেমে এল।

শাকু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার কানে মাহমুদের কথাগুলো বারবার বাজছিল। এত দিন যাকে নিজের বাবা বলে জেনে এসেছে, তাঁর পরিচয় নিয়েই যদি প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সে নিজের অতীতকে কীভাবে বিশ্বাস করবে?

সুভাসিনী ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে এল।

"শাকু, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।"

শাকু তার দিকে ফিরল।

"আপনি কি আগে থেকেই জানতেন, আমার বাবা আমার প্রকৃত বাবা নন?"

সুভাসিনী চুপ করে রইল।

"উত্তর দিন, সুভাসিনী।"

"আমি নিশ্চিতভাবে কিছু জানি না।"

"কিন্তু আপনি সন্দেহ করতেন?"

সুভাসিনীর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

"হ্যাঁ। কিছু কথা শুনেছিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে হারানোর ভয়ে কিছু বলিনি।"

শাকু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"আপনি আমাকে সত্যিটা জানাতে চেয়েছিলেন, নাকি নিজের ভয়টা আমার কাছ থেকে লুকাতে চেয়েছিলেন?"

সুভাসিনী কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাতিঘরের ভাঙা জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছে। দুজন মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকেও যেন অনেক দূরে সরে গেছে।

শাকু ধীরে ধীরে বলল, "আমি জানি না, আপনাকে বিশ্বাস করা উচিত কি না। কিন্তু একটা কথা জানি—আমার বাবার মৃত্যুর সত্য আমি খুঁজে বের করব।"

সুভাসিনী চোখ মুছে তার দিকে তাকাল।

"আমি আপনার সঙ্গে থাকব।"

শাকু কিছু বলল না।

কারণ, সে বুঝতে পারছিল না—যে মেয়েটির চোখে সে নিজের কষ্টের প্রতিচ্ছবি দেখেছে, সেই মেয়েটিই কি তার জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়, নাকি এমন এক রহস্যের অংশ, যা তাকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

সেই রাতে বাড়ি ফিরে শাকু বাবার পুরোনো আলমারি খুলল। বহুদিন ধরে আলমারির নিচের তাকে রাখা একটি ছোট কাঠের বাক্সের কথা তার মনে পড়ল। বাবা জীবিত থাকতে বাক্সটি কখনো খুলতে দিতেন না। একবার কৌতূহলবশত জানতে চাইলে শুধু বলেছিলেন, "সময় হলে সব জানতে পারবি।"

শাকু বাক্সটা বের করল।

তালা ভাঙতে বেশি সময় লাগল না। ভেতরে কয়েকটি পুরোনো ছবি, কিছু চিঠি, একটি হাতঘড়ি আর নীল কাপড়ে মোড়ানো ছোট্ট একটি ডায়েরি পাওয়া গেল।

ডায়েরির প্রথম পাতায় লেখা—

নীল দরিয়া—যে সত্য আমার পরিবারকে ধ্বংস করতে পারে।

শাকুর হাত ঠান্ডা হয়ে গেল।

সে দ্রুত পরের পাতাগুলো উল্টাতে লাগল। বেশির ভাগ পাতায় তারিখ, নাম আর অস্পষ্ট কিছু ঘটনার বিবরণ। কিন্তু মাঝখানের একটি পাতায় লেখা কয়েকটি বাক্য তার চোখ আটকে দিল।

"সেদিন রাতের ঘটনাটা দুর্ঘটনা ছিল না। আমি জানি, কী ঘটেছিল। কিন্তু সত্য প্রকাশ করলে শুধু মাহমুদ নয়, আরও একজন মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন একজন, যার পরিচয় জানার অধিকার শাকুর আছে।"

এর নিচে বাবার স্বাক্ষর।

শাকু ডায়েরিটা বন্ধ করে চোখ বন্ধ করল।

বাইরে বৃষ্টি আরও জোরে পড়ছে। জানালার কাচ বেয়ে পানি নেমে আসছে সরু রেখার মতো। তার মনে হচ্ছে, এত দিন ধরে সে যে জীবনকে চিনেছে, সেটি আসলে একটি অসমাপ্ত গল্পের কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র।

আর বাকি পৃষ্ঠাগুলো লেখা আছে এমন এক সমুদ্রের বুকে, যার নাম নীল দরিয়া।

পরদিন সকালেই শাকু আবার সুভাসিনীর সঙ্গে দেখা করল। আগের দিনের তুলনায় সুভাসিনীকে অনেক বেশি ক্লান্ত লাগছিল। চোখের নিচে কালচে দাগ, মুখে উদ্বেগের ছাপ। শাকু তাকে ডায়েরির কথাগুলো জানাল।

সব শুনে সুভাসিনী দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বলল, "আমার মা বলতেন, কিছু সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, আবার কিছু সত্য এমন শিকল তৈরি করে, যা ভাঙতে পুরো জীবন লেগে যায়।"